অভিজ্ঞতার পঞ্চাশ বছর

(হোমিওপ্যাথিক কেসহিষ্ট্রি)

১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে

ডাঃ জহরুল ইসলাম

সূচী

প্রস্তাবনা	৭
এইডস ও হোমিওপ্যাথি	১০
হোমিও জীবনের প্রথম ডোজ ঃ হিস্ট্রি— এক	১৮
ডেলিভারি কেস ঃ আর্ম প্রেজেন্টেশন ঃ হিস্ট্রি—দুই	২১
জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো ঃ হিস্ট্রি— তিন	২২
শৈশব স্বপ্ন	২৩
হোমিওপ্যাথির উদ্ভব	২৪
দুই টুকরো কেসহিস্ট্রি— চার	২৭
ক্রনিক রোগ চিকিৎসায় শিল্প রহস্য	৩২
প্রাসঙ্গিক কেসহিস্ট্রি—পাঁচ	৩৬
কেসহিস্ট্রি —ছয়	৩৮
কেস হিস্ট্রি—সাত	৪৬
কেস হিস্ট্রি—আট	৪৭
সাধারণ হলেও অসীম গুরুত্বের অধিকারী	৫৪
কেস হিস্ট্রি ফরম	৫৫
কুঞ্জি বা চাবিকাঠি	৬৪
বয়সের তুলনায় ঃ হিস্ট্রি—নয়	৬৫
পেছনের রোগের জটিল কাহিনী ঃ হিস্ট্রি —দশ	৭০
কেসহিস্ট্রি —এগার	৭৭
ছবার অপারেশনের পরেও ঃ হিস্ট্রি —বারো	৮০
হেপাটাইটিস বি ঃ হিস্ট্রি —তেরো	৮৫
জটিল হতে জটিলতর ঃ হিস্ট্রি —চৌদ্দ	৮৯
হাঁপানি ঃ হিস্ট্রি—পনর	৯৪
কেসহিস্ট্রি—ষোলো	৯৬
কেসহিস্ট্রি— সতর	৯৯
হাইপারটেনশন	১০৪
খাজনার চেয়ে ঃ হিস্ট্রি—আঠারো	১১১
হার্টের শিশুরুগী ঃ হিস্ট্রি—উনিশ	১১৪
অপারেশনে বিধ্বস্ত সন্তানহীনা ঃ হিস্ট্রি— বিশ	১১৬
মাদকাশক্তি অকালমৃত্যুর হাতছানি	১২০

সূচী

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাক কথন ১
হোওিপ্যপাথি ও সাধারণ বিশ্বাস ৩
স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় হোমিওপ্যাথি ৬
ডঃ হানেমানের চিকিৎসীত রুগীর কেসহিষ্ট্রি ১৪
অর্গাননের ষষ্ঠ সংস্করণ এবঙ তার পর ১৮
কেসহিস্ট্রি—পাঁচ ২১
অর্গানন শেষ সংস্করণে বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতির প্রশ্নে ২৪
কেসহিস্ট্রি —ছয় ৩০
বিশ্ব হোমিওপ্যাথি কোন্ পথে ৩২
কেস হিস্ট্রি—সাত ৩৮
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যর্থতার কারণ ৪১
কেস হিস্ট্রি—আট ৫২
হোমিওপ্যাথির মর্মকথা ৫৭
কেস হিস্ট্রি—নয় ৬২
ক্রনিক রোগে হোমিওপ্যাথি ৬৪
কেস হিস্ট্রি —দশ ৬৮
হোমিওপ্যাথিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব ৭২
কেসহিস্ট্রি —এগারো ৭৬
মিশ্র মিত্র নয়, অবিমিশ্রই পরম বন্ধু ৭৮
কেস হিস্ট্রি —বারো ৮৪
জালিয়াতির জালে হানেমান ৮৭
কেস হিস্ট্রি —তেরো ৯২
রোগ ও রুগী ৯৭
কেস হিস্ট্রি —চৌদ্দ ১০২
জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় হোমিওপ্যাথির ভূমিকা ১০৬
কেস হিস্ট্রি—পনরো ১০৯
অনুচ্ছেদের জেদ, না খেদ! ১১২
কেসহিস্ট্রি—ষোলো ১১৬
হোমিওপ্যাথি ও প্যাথলজি ১১৯
কেসহিস্ট্রি— সতরো ১২৫
ধাতুগত চিকিৎসায় প্রেসক্রিপশনের ভিত্তি ১২৯

খাজনার চেয়ে ঃ হিস্ট্রি—আঠারো	১৩৪
পরমাণু যুদ্ধ প্রতিরোধে চিকিৎসকদের ভূমিকা	১৩৯
কেস হিস্ট্রি—উনিশ	১৪২
বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথি ঃ উপযোগিতা ও সমস্যা	১৪৫
কেস হিস্ট্রি— বিশ	১৫১
হোমিওপ্যাথিতে 'বাদ' নিয়ে বাদানুবাদ	১৫৫
অভিধান হারিয়ে গেছে	১৬০
অকুণ্ঠিত শুভেচ্ছা	১৬২
সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন	১৬৭
How to become a successful homoeopathic physician	১৭১

এইডস ও হোমিওপ্যাথি

চরম বিভীষিকাময় যে নামটি রোগ-জগতে আসন জাঁকিয়ে বসেছে, তা যে নিতান্তই একটি পিশাচ প্রকৃতির রোগ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জনশ্রুতীতে পিশাচ যেমন আকৃতি-প্রকৃতিতে ধরা পড়ে না, কখন কোন্ দিক থেকে আসে জানা যায় না, ছদ্মবেশে মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেও মানুষেরা বুঝতে বা চিনতে পারে না, এ রোগটিও যে অবিকল তেমনি তা তার নামেই বুঝা যায়।

এইডস (AIDS) ইংরেজি এইড (aid) শব্দটার অর্থ সাহায্য, সহযোগিতা। এর মধ্যে শ্রুতিকটু, বিকৃতি বা বিভীষিকার নাম গন্ধ নেই। বরং শুনতে ভালোই লাগে —সাহায্য, সহযোগিতা। মানবিক গুণাবলীর সর্বোত্তম দিক।

অথচ এই AIDS-কে ব্যবচ্ছেদ করলে কি পাই? Acquired Immune Deficiency Syndrome. হৃৎপিণ্ড কাঁপানো ব্যাপার। মানুষকে ধোঁকা দেবার মতো কতো বড়ো বিভ্রান্তি যা এই নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তেমনি আবার নেই এর কোনো আকার-আকৃতি। না ফোড়ারূপ, না টিউমাররূপ, না ক্ষতরূপ, না অন্য কোনো রূপ, যা সহজে চোখে পড়ে বা মানুষকে হুশিয়ার করতে সহায়ক হয়। কে যে এইডস-এর ভাইরাস বহন করছে, কেই বা তার শিকার, জানার উপায় নেই। এমন কি এতোটুকু সন্দেহ পোষণ করার মতো কোনো চিহ্নই কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এইডস-এর পরিচয়

এইডস-এর পরিচয় এখনো সীমিত। এ রোগ সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনো সুস্পষ্ট নয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে সিনড্রোম (Syndrome) নামের এক প্রকার ভাইরাস (virus) দ্বারা এইডস সংক্রমিত হয়, যার নাম Human Immune Deficiency Virus সংক্ষেপে HIV এটা রেট্রোভাইরাস (retrovirus) অর্থাৎ কয়েকটি ভাইরাসের সমাহার। এইটুকু আপাততঃ বিজ্ঞানীদের ধারণায় রয়েছে। এর বেশী এগোনো এখনো সম্ভব হয়নি। কয়েকটি উপসর্গ ও লক্ষণের ভিত্তি নিয়েই এ রোগ এখন দুনিয়া কাঁপাচ্ছে।

পূর্বেই বলেছি রোগটি পিশাচ-প্রকৃতির। কারণ কার শরীরে যে HIV নামের ভাইরাসটি অবস্থান করছে, কে যে এর বাহক বা কেইবা এইডস-আক্রান্ত, জানার উপায় নেই। যে কেউ এ ভাইরাসের বাহক হতে পারে। এবং তার কাছ থেকেই এটা অন্যের দেহে প্রবেশ করে।

মানব দেহের প্রতিটি জৈব তরল পদার্থের মধ্যে টি-হেলপার (T-helper) নামক এক রকম কোষ আছে, যা Immune System বা প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি। রক্ত, বীর্য ও যোনিরসের মধ্যেই এ কোষের ঘনত্ব বেশী। এই বস্তুটিই HIV-এর লক্ষ্য, যে এই

টি-হেলপার কোষে ঢুকে তার জেনেটিক পদার্থ একেবারেই ধ্বংস করে দেয়। এই ভাইরাসটি দ্বারা সংক্রমিত রোগের নামই এইডস।

বয়স এ রোগের কতো তা বলা যায় না। তবে HIV-এর বর্ণনা পাওয়া যায় আজ (২০০১) থেকে ১৫ বছর আগে ফ্রান্সে। সেই প্রথম। কিন্তু তার পরের বছরই এ রোগ নির্ণীত হয়েছিলো। অতঃপর দ্রুত এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকায়। আর এখন তো গোটা বিশ্বই তার দখলে। অর্থাৎ এইডস-এর রাজ্যে আর সূর্য অস্ত যায় না। হাওয়ার গতি নয়, ইথার গতিতে ঘটেছে এই সম্প্রসারণ।

সংক্রমণের ধারা

HIV নামের এই ভাইরাস যারা বহন করে, তাদের দ্বারাই এইডস সংক্রমিত হয়। অথচ HIV-এর বাহকেরা জানে না যে, সে ভয়ঙ্কর এক রোগের ভাইরাস বহন করছে এবং অবৈধ সমকাম বা বহুকামের মাধ্যমে অথবা সম্ভাব্য অন্যান্য উপায়ে মারাত্মক এইডস-এর বীজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বাহকের দেহে এ রোগের কোনো লক্ষণ থাকে না। এমন কি যার দেহ থেকে সে এ রোগ পেয়েছে তার দেহেও কোনো লক্ষণ না-ও থাকতে পারে। বছরের পর বছর ভয়ঙ্কর এই ভাইরাস বহন করে চলে বাহক। অবশেষে একদিন সে নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়বে। অর্থাৎ HIV কালক্রমে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থার টি-হেলপার কোষ ধ্বংস করবে। এবং এভাবেই নেমে আসবে বাহকের জীবনে করুণ পরিণতি।

বাহক বা রুগীর কাছ থেকে HIV সংক্রমিত হবার মাস কয়েক পরে রুগীদেহে অ্যান্টিবডি (anti-body) তৈরী হয়। যথারীতি পরীক্ষার দ্বারা এগুলো ধরা পড়ে।

এইডস বাহক বা রুগীর রক্ত, বীর্য ও যোনিরস কোনো সুস্থ্য মানুষের রক্ত, বীর্য ও যোনিরসের সংস্পর্শে এলেই এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। অবশ্য HIV খুব বেশী সক্রিয় নয় বলে সংক্রমণের জন্য এর ঘনত্ব বেশী হওয়ার দরকার পড়ে। কাজেই একাধিকবার সংস্পর্শে না এলে সংক্রমণ না ঘটার সম্ভাবনাই বেশী।

এইডস রুগী বা ভাইরাস বহনকারীর সাথে যৌন সংগমের মাধ্যমে এ রোগ সংক্রমিত হয়। সমকাম হোক আর বিপরীত কাম হোক, ঝুঁকি উভয় ক্ষেত্রেই সমান। সংক্রমিত হবার অন্যান্য যে পথ, তা হলো—

(ক) সংক্রমিত মানুষের দেহে ব্যবহৃত ইনজেকশনে সূচ-সিরিঞ্জ ব্যবহার।

(খ) সংক্রমিত লোকের রক্ত অন্যের শরীরে পরিসঞ্চালন।

(গ) সংক্রমিত মায়ের গর্ভধারণ ও প্রসব।

মনে রাখা প্রয়োজন, রক্ত, বীর্য ও যোনিরস—এই তিনটি জৈব তরল পদার্থই এইডস সংক্রমণের বড়ো পথ। এসব ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। যৌনসংসর্গের ব্যাপারে অত্যন্ত হুশিয়ার হতে হবে। যারা যৌন ব্যধিতে আক্রান্ত, যাদের যৌনাঙ্গে ক্ষত আছে, তাদের সংসর্গ এড়িয়ে চলতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে দেহ-পসারিনী নারী-পুরুষকে।

যে সব ক্ষেত্রে সংক্রমণের ভয় নেই

এইডস-আক্রান্ত ব্যক্তিকে নির্বাসনে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। এমন কি হাসপাতালে না দিলেও চলে। বাড়ীতে রেখে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় তাকে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

প্রাত্যহিক জীবনে এইডস রোগীকে অস্পৃশ্য করে রাখার কোনোই দরকার পড়ে না। কারণ HIV বাহক বা এইডস রুগীর সাথে করমর্দন করলে রোগের সংক্রমণ ঘটে না। তেমনি এ ভাইরাস ছড়ায় না তার সাথে উঠাবসা, খাওয়া-লওয়া, খেলা-ধুলা করলে। এ ছাড়াও খাদ্য, পানীয়, কীটপতঙ্গ, পায়খানায় উপবেশন, বারোয়ারী পাত্র ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমেও এ ভাইরাস ছড়ায় না। কাজেই পূর্ণ সামাজিক মর্যাদার সাথে এইডস রুগীকে ঘরে রেখে চিকিৎসা করা যেতে পারে। শুধু তার রক্ত বা বীর্য কিংবা যোনিরস সম্পর্কে হুশিয়ার থাকলেই হলো।

HIV বাহক বা এইডস আক্রান্ত পিতার ঔরষজাত বা মায়ের গর্ভজাত সন্তানের দেহেও এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। কাজেই সন্তান ধারণের পূর্বে স্বামী স্ত্রী উভয়েই নিশ্চিত হবেন, এইডস থেকে তারা মুক্ত কি না।

মূল কারণ

অবৈধ ও উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচারই এইডস সংক্রমণের প্রধানতম পথ। এবং আরেকটি হলো রক্ত পরিসঞ্চালন, এ কথা আগেই বলেছি। এবার আসছি এমন একটি কথায়, যা নিয়ে তথাকথিত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বড়ো একটা মাথা ঘামায় না।

মানব দেহে রোগ প্রবণতা(susceptibility) না জন্মালে কোনো ভাইরাস বা জীবাণু সক্রিয় হতে পারে না, পারে না মানুষকে শিকারে পরিণত করতে। প্রতিদিন মানবদেহে লক্ষ লক্ষ জীবাণু বা ভাইরাস ঢুকছে। কিন্তু ক'জন রোগাক্রান্ত হচ্ছে? বলা হচ্ছে, যার ইম্যুনিটি আছে তার রোগ হয় না, যার ইম্যুনিটি নেই, সেই ব্যক্তি আক্রান্ত হয়। তাহলে (susceptibility) বা রোগ প্রবণতা ও ইম্যুন (Immune) কি এক বস্তু?

রোগপ্রবণতা একটি সামগ্রিক জিনিস। মানবদেহে এ প্রবণতা জন্মালে তার যে কোনো রোগ হতে পারে। ভাইরাস বা জীবাণু তখনই হয়ে ওঠে অর্থবহ। পক্ষান্তরে ইম্যুনিটির ব্যাপারটা সামগ্রিক নয়, পৃথক পৃথক। তাই কলেরার জন্য ইনজেকশন, বসন্তের জন্য টিকা এছাড়াও বিসিজি, ডিজিটি ইত্যাদি। আর এসব রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা দোষমুক্ত নয়, পেছনে বেশ কিছু কুফল রেখে যায়। এছাড়া HIV-কে বলা হয়েছে একটি রেট্রোভাইরাস অর্থাৎ কয়েকটি ভাইরাসের সমষ্টি। তবুও কিন্তু তার উৎপাদক শুধু মাত্র এইডস। এখানেই ইম্যুন ও সাসসেপ্টিবিলিটির মধ্যে পার্থক্য।

রোগ প্রবণতা সৃষ্টির কারণ

রোগ প্রবণতা সৃষ্টির পেছনে যে সব কারণ রয়েছে তার মধ্যে প্রধান হলো অ্যান্টিবায়োটিক্সের ব্যবহার। শুধু অ্যান্টিবায়োটিক্স নয়, রোগচাপা দেওয়া যে কোনো রকম ওষুধ, ইনজেকশন, মলম, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, এক্সরে, রেডিওথেরাপি ও অকারণ অপারেশন। কলেরার ইনজেকশন, বসন্তের টিকা, বিসিজি, ডিপিটি ইত্যাদি এর মধ্যেই

পড়ে। রোগ চিকিৎসা ও প্রতিরোধের নামে এসব প্রকৃতি বিরুদ্ধ ব্যবস্থায় জীবনীশক্তি (vitalforce) দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে জন্ম নেয় রোগ প্রবণতা।

এছাড়া আরো কিছু উপাদান আছে যা এ সব রোগ উৎপাদনে ও প্রসারে সহায়ক হতে পারে। সহায়ক না বলে বরং বলা যায় —এরাই ঘরশত্রু বিভীষণের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করে, দেহ ও মনকে দুর্বল ক'রে বহিঃশত্রু প্রবেশের পথ সুগম ক'রে দেয়। এ সব উপাদানের মধ্যে রয়েছে—

(ক) ফসলের ক্ষেতে, পানিতে, ঘরে কীটনাশক ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার। এ সব কীটনাশক শুধু কীট নাশ করেই ক্ষান্ত হয় না, খাদ্যের সাথে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে পানীয়ের সাথে মানুষের দেহে ঢুকে রক্ত দূষিত করে।

(খ) অধিক খাদ্য ফলানোর জন্য কেমিক্‌ল্ সারের ব্যবহার ; তাতে ফলন বৃদ্ধি হলেও সে ফসলের খাদ্যবস্তুতে পুষ্টিগুণ খুব কম থাকে।

(গ) বাছ-বিচার না করেই, যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই যে কোনো লোকের দেহ থেকে রক্ত লওয়া।

(ঘ) যৌন উত্তেজনামূলক চলচ্চিত্র, বই, পত্রিকা, বিশেষ ক'রে ভিসিআর।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, শুধু এইডস নয়, ক্যানসার, আলসার, পক্ষাঘাত, গলষ্টোন, হেপাটাইটিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগের আক্রমণ পথ উল্লিখিত বস্তুগুলোর দ্বারা সুগম হয়ে থাকে। কারণ এসব বস্তু মনকে দুর্বল করে, তাতে উচ্ছৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, তেমনি রক্তদুষ্টির কারণে দেহের শক্তিও কমে আসে। আর সেই দুর্বলতার সুযোগে মনের মধ্যে জন্ম নেয় susceptibility বা রোগপ্রবণতা। এভাবেই প্রাণশক্তি (vital force) হারায় শৃঙ্খলা। এবং তখন জন্ম নেয় রোগ। আসল কথা হলো, প্রাণশক্তি দুর্বল না হলে কোনো রোগশক্তিই পারে না মানুষকে রোগগ্রস্ত করতে।

এইডস্ রোগের লক্ষণ

এইডস রোগের লক্ষণের ক্ষেত্রে দুটি স্তর আছে।

(ক) প্রথম স্তরকে HIV carrier বা এইডস রোগের জীবাণুবাহক বলা যায়। শারীরিকভাবে এর কোনো লক্ষণ নেই। তবে মানব শরীরে এ জীবাণু প্রবেশ করার ৩ দিন থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রচণ্ড জ্বর হয়, শরীরে ও হাড়ে ব্যথা হয়, বমি বমি ভাব, মাথাব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময় দেখা দেয়। সপ্তাহ খানেক এ অবস্থা চলার পর রুগী ভালো হয়ে যায়॥

এ সময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিলে দ্বিতীয় স্তরের মারাত্মক পরিণতি আর দেখা দেয় না।

(খ) দ্বিতীয় স্তর দেখা দেয় প্রথম স্তর শেষ হবার ৩/৪ বছর পরে।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরেও প্রথম স্তরের মতোই লক্ষণ দেখা দেয়। অর্থাৎ জ্বর, নিউমোনিয়ার মতো জ্বর, সমস্ত শরীর ও হাড়ে ব্যথা, উদরাময়, দেহের বিভিন্ন স্থানে পচন ধরা, এমন কি সাধারণ সর্দি কাশিও হতে পারে।

চিকিৎসা

ক্যানসার, অ্যাজমা, ডায়াবিটিস ইত্যাদি incurable রোগের মত এইডস রোগেরও ওষুধ এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। যুগ যুগ ধরে উল্লিখিত incurable রোগ সমূহের ওষুধ যখন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি তখন এইডস-এর ওষুধ এতো অল্প সময়ে আবিষ্কার করা কি করে সম্ভব হতে পারে, কাজেই এইডসও incurable রোগ। এটা অবশ্য অ্যালোপ্যাথির বেলায়।

হোমিওপ্যাথিতে যাবতীয় incurable রোগের মতো এইডস-এরও ওষুধ আছে। অপচিকিৎসা-কুচিকিৎসা দ্বারা যদি রুগীকে বিধ্বস্ত করা না হয়, তাহলে এইডস রুগী হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসা হতে পারে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিটাই অন্য প্রকারের। রোগের ওপর এ পদ্ধতির চিকিৎসা নির্ভর করে না। লক্ষণ সমগ্রই (totality of symptoms) হোমিওপ্যাথির প্যাথলজি। রোগ যাই হোক না কেনো, তার কিছু লক্ষণ রুগীদেহে দেখা দেয়। রুগীর নিজস্ব কিছু লক্ষণও থাকে, থাকে তার শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস ও প্রবণতা ; তাছাড়া রুগীর পরিবেশ, জীবনাচার এবং রোগের কারণ (causation) ইত্যাদি। এ সবের সমাহারই রোগের লক্ষণসমগ্র (totality of symptoms)। এই লক্ষণসমগ্র নিয়েই একটা রুগী। তাই বলা হয়ে থাকে, হোমিওপ্যাথি রুগীর চিকিৎসা করে, রোগের নয়। কারণ রোগের নামের ওপর চিকিৎসা চলে না এই জন্যে যে, একজন রুগীর ধাতুগত (constitutional) লক্ষণ সার্বিকভাবে রোগ লক্ষণের মধ্যে থাকে না। তাছাড়া একজনের ধাতুগত লক্ষণ অন্যের ধাতুগত লক্ষণের সাথে খাপ খায় না বা একই প্রকারের হয় না। অথচ হোমিওপ্যাথলজিই হলো লক্ষণ সমষ্টি। অ্যালোপ্যাথিতে যেমন প্রথমে রোগটা চিনবার প্রয়োজন পড়ে, রোগ না চিনতে পারলে ওষুধ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, কারণ এ পদ্ধতিতে রোগের জন্য ওষুধ, অর্থাৎ পদ্ধতিগতভাবে অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি পরস্পর বিরোধী। ফলে রোগের নামের ওপর হোমিওপ্যাথিতে কিছুই করার নেই। কারণ হোমিও ওষুধগুলো সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত। সুস্থ্য দেহে ওষুধ প্রয়োগ করলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেইসব লক্ষণই প্রয়োগকৃত ওষুধটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোনো রুগ্ন দেহে অনুরূপ লক্ষণ দেখা দিলে ঐ বিশেষ ওষুধটিই সে রুগীর জন্যে সঠিক ওষুধ, অন্য ওষুধে সে রোগ বসে যেতে (suppressed) পারে, কিন্তু নিরাময় হবে না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, একই রোগের বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণ হতে পারে। ফলে তাদের ওষুধ হয় ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণেই রোগের নামের ওপর ওষুধ দেওয়া চলে না।

বিগত দুশ' বছরাধিক কাল এই ঘটনাগুলো ঘটে আসছে। তবুও একশ্রেণীর লোক অযৌক্তিক উন্নাসিকতা দিয়ে এই চরম বাস্তবতাকে অস্বীকার করে চলেছে। তাতে একদিকে যেমন অসহায় রুগ্ন মানুষের রোগকষ্ট বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে একটা বাস্তব সত্যকে অস্বীকার অবহেলার কষাঘাতে দাবিয়ে রাখার ঘৃণ্য অপচেষ্টা চলছে।

আশু করণীয়

Incurable হিসেবে যে সব রোগ পরিচিত, সেসব রোগে আক্রান্ত রুগীদেরকে হোমিওপ্যাথিতে পাঠানো উচিত। দেশের প্রতিটি হাসপাতালের সাথে একটি হোমিও বিভাগ থাকলে একাজ সহজ হতে পারে।

এ ব্যাপারে রোগ নির্ণীত (diagnosis) হওয়ার সাথে সাথে রুগীর দেহে কোনো ওষুধ প্রয়োগ না করে তাকে হোমিওপ্যাথিতে হস্তান্তর করা একান্ত প্রয়োজন। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ দিলে বা অস্ত্রপচার করলে কিংবা রেডিও থেরাপির মাধ্যমে যদি নিরাময় করা যেতো, তাহলে কথাই ছিলো না। কিন্তু তা যখন হয় না, তখন জেনে শুনে তা করার মতো অপরাধ আর কি হতে পারে? কারণ অপচিকিৎসা ও কুচিকিৎসায় রোগ ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করে। অপারেশনে জটিলতা বাড়ে আরো কয়েক ধাপ। এবং রেডিওথেরাপি রুগীকে একেবারেই বিকল করে দেয়, রোগ হয়ে পড়ে ইনকিউরাবল্। কাজেই তথাকথিত ইনকিউরাবল্ রোগগ্রস্ত রুগীর রোগ ডিটেকটেড হবার সাথে সাথে হোমিপ্যোথিতে যাবার পরামর্শ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটাই জনকল্যাণমূলক কাজ ও মানবিকতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

যাই হোক, পূর্বেই বলা হয়েছে, হোমিওপ্যাথি রোগ চিকিৎসা করে না, রুগী অর্থাৎ রুগীর লক্ষনসমষ্টিই (totality of symptoms) হোমিওপ্যাথির একমাত্র লক্ষ্য, রোগ তার যা-ই হোক না কেনো। বিষয়টাকে স্পষ্ট করার জন্য একটা উদাহরণ ঃ—

এক্স, ওয়াই, জেড—তিনজন রুগী। তিনজনেরই একই রোগ। ধরা যাক প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টে জানা গেলো, রোগ ক্যানসার। অর্থাৎ তিনজনই ক্যানসারগ্রস্ত। এবার লক্ষণ সংগ্রহ।

এক্স ঃ মোটাসোটা শরীর, হঠাৎ রাগ ওঠে, সে রাগ কমতে চায় না, রাগলে তোৎলায়, শীতকাতর, সন্দেহপ্রবণ, গোপনতাপ্রিয়, কথা কম বলে, একগুঁয়ে, আত্মহত্যা করতে চায়, শুচিবাইগ্রস্ত, সংস্কারাচ্ছন্ন, বদ্ধমূল ধারণা, মনে করে শরীরটা ভঙ্গুর, মনে করে পাশে কে যেন আছে, পায়খানা অল্প একটু হবার পর উপরে উঠে যায়, কখনো বা আঙুল দ্বারা মল বের করতে হয়। পেটের মধ্যে গোঁ-গোঁ শব্দ হয়, শরীরে আঁচিল, লবণ বেশী খায়, চা বা কাঁচা পেয়াজ খেতে চায় না, প্রস্রাবে মাঝে মধ্যে জ্বালা, জ্বালা প্রস্রাব শেষে, রোগের বৃদ্ধি বিকেল তিনটায় ও রাত তিনটায় এবং ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসে।

ওয়াই ঃ একহারা চেহারা, কৃপণ ধরনের, দান খয়রাত করে খেয়াল বশে, খেয়াল হলে দান করলো, খেয়াল হলো না পিটিয়ে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলো, গরমকাতর, মানুষের সামনে কথা বলতে নার্ভাস হয়ে পড়ে, ক্রমে ক্রমে সেভাব কেটে যায়, ধন্যবাদ দিলে বা সুখবর পেলে কিংবা বহুদিন পরে বন্ধুর সাথে দেখা হলে কেঁদে ফেলে, রোগ ডান দিকে, কখনো ডান থেকে বামে যায়। পেটুক, ঘনঘন ক্ষুধা, পেট ফাঁপা, ঢেকুর উঠলে বা বায়ু সরলে ক্ষণিকের জন্যে উপশম, শরীরের উপরের দিকে শীর্ণ, নীচের দিকে শীর্ণ নয়। এক পা ঠাণ্ডা অন্য পা গরম, ঘাম-আস্বাদ ঢেকুর বমন সবই টক, মাথা ও মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা ছাড়া অন্য সকল যন্ত্রণা উত্তাপে কমে, যাবতীয় কষ্টের বৃদ্ধি বিকেল ৩/৪টা থেকে রাত ৮/৯টা, কখনো বা সমস্ত রাত, চা খুব গরম না হলে খায় না।

জেড ঃ হালকা পাতলা একহারা, ধার্মিক, কাজ করতে চায় কিন্তু পারে না, অবসাদ, হতাশ, আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছা, হ্যালুসিনেশন্, খুব ভীতু, শব্দভীতি, মন সব সময় দুঃখভারাক্রান্ত, কথায় কথায় কাঁদে, জীবন ধারণ বৃথা মনে করে। আত্মবিশ্বাসের অভাব, মানসিক শ্রমে কাতর, ব্যর্থপ্রেমের পর রোগের উৎপত্তি, মুখ তিতে, দুর্গন্ধ লালা পড়ে, দুধ খেতে চায়, মাংশে অসুবিধে, মলে ও বায়ুতে দুর্গন্ধ, ঘনঘন প্রস্রাব চাপে, পরিমাণ অল্প, ঘুমের মধ্যে কাঁদে, চোরের স্বপ্ন দেখে, ভয় পায়, চিৎকার করে, ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না।